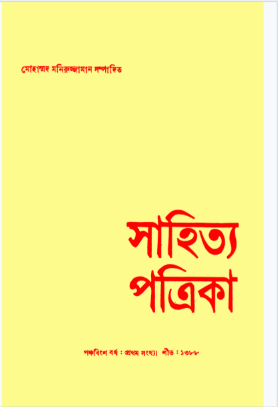

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আশুতোষ ভট্টাচার্য
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.11
Pages	185-196
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ছাত্র

১৯২৮ সনের জুলাই মাসে আমি স্নাতক শ্রেণীতে সংস্কৃত ও বাংলা সাম্মানিক বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তা আজ থেকে তিপ্পান্ন বছর আগেকার কথা। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বাংলা সাম্মানিক বিষয় নিয়ে কেউ ভর্তি হতে পারত না ; আটটি পত্রের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে চারটি সংস্কৃত ও বাকি চারটি বাংলা নিতে হতো। সুতরাং আগে থেকে যারা সংস্কৃত বিষয়টি কিছু পড়ে না আসত, তারা এই বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত না। যদিও বাংলায় অনুরাগের জন্যই এই বিষয়টি আমি পাঠ্য বলে গ্রহণ করেছিলাম, তবু সংস্কৃত বিষয়েও আমার সামান্য অধিকার ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে শতকরা আশীভাগের বেশী সংখ্যা পেয়ে আবশ্যিক এবং অতিরিক্ত দুটি পত্রেই দুটি কৃতিত্ব-চিহ্ন পেয়েছিলাম, তা ছাড়া অন্য বিষয়েও তা' ছিল। তারপর আই.এ. পড়বার সময়ও সংস্কৃত আমার একটি অন্যতম বিষয় ছিল। প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করে আই. এ. পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। সুতরাং আমার এই বিষয়ে ভর্তি হবার বিষয়ে কোনো বাধা হয় নি। কিন্তু ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত আশঙ্কাও দূর হয় নি।

কারণ, ভর্তি হবার আগে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হতো। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে খুসী হলে তবে ভর্তির অনুমতি দিতেন, নতুবা নয়। তখন সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ এবং সংস্কৃত বিভাগের একজনই অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর নাম জানতাম ডক্টর সুশীলকুমার দে, কিন্তু মানুষটিকে তখনো চিনতাম না। আমি আই. এ. পড়বার সময় রমনাতেই ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পড়তাম এবং তার ছাত্রাবাসেই থাকতাম। তার ছাত্রাবাসটি ঢাকা হলের পুকুরের অপর তীরে, সেখান থেকে 'লিটন হল,' 'কার্জন হল' বেশী দূরে নয়, প্রায়ই যখন সে সব জায়গায় বক্তৃতা হতো তখন রবাহূত কিংবা অনাহূত হয়ে গিয়ে বড় বড় অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতাম। তাদের প্রায় কিছুই বুঝতাম না, তবে অনেক অধ্যাপককেই তা থেকে চিনতাম। কিন্তু ডক্টর সুশীল-কুমার দে-কে কোনদিন ওসব সভায় দেখিনি। পরেও দেখেছি, তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা আসতেন না। তাই তাঁর নামটি জানা থাকলেও তাকে কোনদিন প্রত্যক্ষ দেখিনি। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথায় একটু আশঙ্কিত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন।

নির্দিষ্ট দিনে ভর্তির দরখাস্তটি হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হিন্দুস্থানী দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, কি চাই ?

আমি বললাম, ভর্তি হতে চাই। ডক্টর দে'র সঙ্গে দেখা করব।

সে বলল, যান, ভিতরে যান।

উদ্বিগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করলাম, এক মুহূর্ত শুধু দেখলাম, একজন দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ আদ্যোপান্ত ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত, তাকে শ্বেতাঙ্গ বলেই ভ্রম হলো, তিনি মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কি পড়ছেন। আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে পিছিয়ে বাইরে চলে এলাম।

দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, কি হলো ?

আমি বললাম, আমি সংস্কৃত ও বাংলার যিনি প্রধান সেই ডক্টর সুশীলকুমার দে'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। এ'ত দেখছি একজন সাহেব।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ইউরোপীয় অধ্যাপকও ছিলেন।

হিন্দুস্থানী দারোয়ান ঈষৎ হাস্য করে বলল, আরে ঐত দে' সাহাব। তারপর আমার সম্পর্কে যে রসিকতাটি করল, তা এতদিন পর এখানে আর উল্লেখ করতে চাই না।

আমি আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, ভাবলাম, এই হিন্দুস্থানীর কথায় বিশ্বাস করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ সে আমার উপর যে রসিকতাটি করেছিল, তারজন্য তার উপর আমার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলাম, আর একজন কাউকে পেলে তাকে জিজ্ঞেস করে নেব।

ডঃ দে'র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছিলাম, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম, সেই ঘরের দরজার ঠিক উপরে একটি কাঠের টুক্‌রোয় ইংরেজিতে লেখা আছে, Head of the Department of Sanskritic Studies and Sanskrit and Bengali. কথাটি আমার কাছে খুব স্পষ্ট মনে হলো না। আমার মনে হলো এখানে তিনটে বিষয় আছে, একটা Sanskritic Studies আর একটা Sanskrit এবং আর একটা Bengali; আমি বুঝলাম এই ঘরে যিনি আছেন, তিনি তিনটে বিষয়েরই বিভাগীয় প্রধান। এমন যে পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি তিন তিনটে বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি সহজ কথা ? আমার যেন সব কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল।

এমন সময় বারান্দা দিয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টর সুশীলকুমার দে কি এই ঘরে বসেন ? বলে ঘরটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, হ্যা, তিনি এই ঘরেই বসেন, তিনি আছেন কি না দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

বুঝতে পারলাম তিনি একজন অধ্যাপক, আমাকে ছাত্র মনে করেছেন, আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পারি বলে যে তিনি ভাবতে পারেন, তা ভেবে আমি মনে মনে গর্বিত হলাম। তারপর সাহসে ভর করে আবার ডক্টর দে'র ঘরে ঢুকে পড়লাম।

এ'বার ডক্টর দে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন; চোখে সোনার চশমা, মুখ ভরা একটি প্রসন্ন হাসি; কণ্ঠে স্নেহসিক্ত নম্রস্বর, আমার হাতে ভর্তির দরখাস্তটি দেখতে পেয়েই বোধ হয় বললেন, ভর্তি হবে ? এসো, এ'দিকে এসো। তারপর হাত বাড়িয়ে আমার দরখাস্তটি নিজে হাতে করে নিলেন।

দরখাস্তটি চোখ বুলিয়ে তেমনি নম্র স্বরে বললেন, ভালো, বেশ ভালো। গোড়া থেকেই ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, তা হলে ভাল ফল হবে। এখানে ছাত্র কম, শিক্ষক বেশী, ভালো করে পড়াশোনা করলে সবাই তোমার উপর যত্ন নিবেন।

তারপর একটি প্রশ্ন করলেন, তোমার সংস্কৃত বেশী ভাল লাগে, না বাংলা ?

আমি মহা সঙ্কটে পড়লাম। শুনেছি, তিনি সংস্কৃত বিষয়ে যেমন পণ্ডিত বাংলাতেও তাই, আমি যদি বলি যে আমার বাংলা বেশী ভাল লাগে তবে তিনি ভাববেন, আমি সংস্কৃত ফাঁকি দেব, অথচ আসল ব্যাপারটা তাই। বাংলার জন্যই আমাকে সংস্কৃত পড়তে হচ্ছে, আমি সত্য কথাই বললাম, আমার বাংলাই বেশী ভালোলাগে।

দেখলাম, তিনি খুশীই হলেন, বিরক্ত হলেন না, তবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একটা সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ বল।

আই. এ.তে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র ৫ম সর্গ আমাদের পাঠ্য ছিল, অনেকগুলো শ্লোক আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা মাত্র আমি মুখস্ত বললাম।

তিনি শুনে বললেন, না সংস্কৃতও তুমি ভালবাসো দেখছি; ভালোবাসা না থাকলে কেউ কিছু তার মুখস্থ বলতে পারে না। তুমি ভালো করতে পারবে।

এই বলে তিনি ভর্তির অনুমতি লিখে দিলেন। আমি যথাস্থানে টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। মাহিয়ানা মাসিক আট টাকা মাত্র। কিন্তু ক্লাশ আরম্ভ হতে এখনো দিন কয়েক বাকি।

তখনো কি কি বিষয়ে যে আমাকে পড়তে হবে, তা আমার জানা নেই। একটি পাঠ্য তালিকা সংগ্রহ করলাম। কিন্তু সেটি পড়েও বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হলো বিশ্বের এমন কোনো বিষয় বাদ নেই, যা আমার পড়তে হবে না। আমার আগে-কার বছরের কোনো ছাত্রের সন্ধান করলাম, শুনলাম, সে' বছর কোনো ছাত্র নেই; একজন কে ছিল, সে ছেড়ে দিয়েছে; দু'বছর আগেকার শ্রেণীতে অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষ সাম্মানিক শ্রেণীতে পড়ছেন এমন দু'জন ছাত্র আছেন সত্য—একজন পরে কবি-খ্যাতি লাভ করে ছিলেন, তিনি অজিতকুমার দত্ত, আর একজন স্বরেশচন্দ্র দাস। তাঁরা প্রবীণ বলে আমার মত অর্বাচীনের সঙ্গে সর্বদা দূরত্বের এত ব্যবধান রেখে চলতে চাইতেন যে প্রথম প্রথম তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের চেষ্টা করা আকাশকুসুম বলে মনে হতো। ক্লাশে পড়াশোনা আরম্ভ হওয়ার আগে কোনো শিক্ষকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছি-লাম না। সেই সময়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং হলের ছাত্রদের বিশ্রামাগারে দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকার পাতা উলিটিয়েই সময় কাটাতাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশ্রামা-গারে এমন সব বিদেশী পত্র-পত্রিকা আসত, যা ঢাকা ত্যাগ করবার পর আর ভারতবর্ষে বিশেষ কোথাও দেখতে পাইনি। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইংরেজি ব্যঙ্গ পত্রিকা *Punch* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অজস্র এমনই পত্রিকা সেখানে টেবিলের উপর পড়ে থাকত, সেখানে ছাত্রের ভীড় ছিল না, পত্রিকা নিয়ে কেউ কাড়াকাড়িও করত না। নিরুপদ্রবে সেখানে বসে নানা পত্রিকা পড়বার সুযোগ পেতাম।

তারপর ১৯২৮ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে আমাদের পড়া আরম্ভ হলো। আমার পাঠ্য জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে ঘটল। কবি-সমালোচক

মোহিতলাল মজুমদার যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে প্রথম যোগদান করলেন, সে দিন আমি সেখানে ছাত্র-রূপে প্রথম ক্লাশে যোগদান করলাম, প্রথম দিনই আমি তাঁর সঙ্গে ক্লাশ করবার সুযোগ পেলাম। ক্লাশ করতে গিয়ে জানতে পারলাম, আর একটি ছাত্র আমার সতীর্থ রূপে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু সে কোনদিন ক্লাশে আসেনি, সে জন্য তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কিন্তু প্রথম দিন ক্লাশ করতে আরম্ভ করেই আমাদের পাঠ্য-তালিকার গুরুত্বটি বুঝতে পারলাম। আজকের ছাত্রেরা যা পড়ছে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে সুবিধা হবে বলে আমাদের সে দিনকার পাঠ্যতালিকার কথাও একটু সংক্ষেপে বলতে চাই। পাঠ্যতালিকাটি হাতে নিয়ে আমি দেখলাম, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসবার জন্য আমাকে অনেক দাম দিতে হবে। তবে ভালোবাসার সত্যকার কোনো দাম নেই, তাই সব কিছু মাথা পেতেই সয়ে নিতে হয়েছিল। পাঠ্যপত্রটি সংক্ষেপে এই প্রকার ছিল :

প্রথম পত্র : সংস্কৃতনাটক, কাব্য, গদ্যকাব্য

(১) কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক (সম্পূর্ণ)
(২) ভর্তৃহরির 'উত্তর-রাম-চরিত' নাটক (সম্পূর্ণ)
(৩) ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্য (নির্বাচিত সর্গ)
(৪) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' (গদ্যকাব্য) কথামুখ অংশ

দ্বিতীয় পত্র : পালি, প্রাকৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব

তৃতীয় পত্র :

(১) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (ইংরেজীতে) (৫০)
(২) সংস্কৃত ব্যাকরণ; আপ্তে রচিত ইংরেজি সংস্করণ (৫০)

চতুর্থ পত্র : পাঠ্যবহির্ভূত সংস্কৃত গদ্য-পদ্য রচনার ইংরেজি অনুবাদ।

পঞ্চম পত্র : প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলা

ষষ্ঠ পত্র : আন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা

সপ্তম পত্র : (ক) উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ যুগের বাংলা সাহিত্য—গদ্য ও পদ্য
(খ) রবীন্দ্রনাথ; পদ্য—সঞ্চয়িতা, গদ্য—পঞ্চভূত

অষ্টম পত্র : পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বিষয় ও প্রবন্ধ রচনা।

অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, কে কোন বিষয় পড়াবেন, তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। যেমন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' এবং এবং আপ্তের সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করলেন। শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারবির 'কীরাতার্জুনীয়ম্' কাব্য পড়ানোর সূচনা করলেন, শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক (পরে ডক্টর) পালি ভাষা পড়াতে লাগলেন, অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রাকৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলা পড়ানোর কথা, কিন্তু তিনি তখন ডি.লিট. উপাধির জন্য প্যারিস গিয়েছেন, তাঁর জায়গায় শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাকৃত পড়াতে লাগলেন, ডক্টর সুশীলকুমার দে স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়ানো আরম্ভ করলেন, শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং রবীন্দ্রনাথের

পঞ্চভূত ও সঞ্চয়িতা পড়াতে লাগলেন, কবি মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পড়াতে লাগলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্র পড়াবেন জানালেন। এই ভাবে নিয়মিত পড়া আরম্ভ হয়ে গেল।

আমি একা একাই ক্লাস করতে গেলাম, অবশ্য দু একটি ক্লাশ অন্য উচ্চতর ক্লাশের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হতো, তাতে আরো দু' তিন জন ছাত্র থাকত সত্য, কিন্তু তারা প্রবীণ বলে আমাকে নিতান্ত কৃপার পাত্র বলে মনে করে সব সময় আমার কাছ থেকে একটু দূরে দূরে সরে থাকত। সংস্কৃত বিষয়ে দু একটি ছাত্রীও পড়ত, তারা সবাই আমার চাইতে বয়স এবং বিদ্যায় উভয় দিক থেকেই প্রবীণা বলে তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সাহস পেতাম না। তারাও ক্লাশের মধ্যে চুপ করে গম্ভীর হয়ে আলাদা আসনে স্থির হয়ে বসে থাকত। ক্লাশে অনেক সময় অধ্যাপকই হাসির কথা বলতেন, তারা তাতে যোগ দিত না, আমিও হাসতে সাহস পেতাম না। প্রবীণ ছাত্রেরা হাসত, তাদের হাসি শুনে হাসি চেপে রাখতে অনেক সময় আমার খুব কষ্ট হতো। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না।

কয়েকদিন চলে যাওয়ার পর আরেকটি যে ছাত্র আমার সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল, সে এসে একদিন ক্লাসে হাজির হলো। ভাবলাম আমার নিঃসঙ্গতা দূর হ'লো। আমি তার পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে মৈমন্‌সিংহ জিলার শেরপুরের এক জমিদারের ছেলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্লাস ত এই কয়দিন হয়ে গেল, তুমি আসনি কেন?

সে বলল, দেখছ ত, যা সংস্কৃতের চাপ, আমি তা কুলিয়ে উঠতে পারব না। আমি পালাব। আমি সংস্কৃত জানি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে ভর্তি হয়েছিলে কেন?

সে বলল, শুধু দেখবার জন্য, দেখলাম, পাঠ্য তালিকাতেই বুঝলাম, আমার কি পড়তে হবে। আমি আর আসব না, তুমি পড়।

সত্য সত্যই সে আর এলো না। একদিন শুধু দেখা দিয়েই কোথায় যে চলে গেল, আর কোনদিন তার দেখা পাই নি। পরে কেউ বলত, সে পুলিশের গুপ্তচর ছিল, আবার কেউ বলত, সন্ত্রাসবাদী ছিল।

কয়েকজনের ক্লাসে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বেশ মনে আছে, এখনো তা স্মৃতি থেকে স্পষ্ট উদ্ধার করতে পারি। প্রথমে কবি মোহিতলালের কথাই বলি। আগেই বলেছি, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন। ইতিপূর্বে মোহিতলাল কোলকাতার মেট্রোপলিটান উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, সেখান থেকে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করে এ'দিক সে'দিক কোনোদিকে তাকালেন না, মনে হলো একটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ানোর জন্য খুব তৈরী হয়ে এসেছেন। উঁচু মঞ্চের উপর চেয়ারে উঠে বসে সম্মুখে ছাত্রের আসনে আমাকে মাত্র দেখতে পেলেন, কি ভাবলেন বুঝতে পারলাম না, তিনি চুপ করে বসে রইলেন। আমাকে কি ছাত্রের মধ্যেই তিনি গণ্য করছেন না? সেইটেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম ক্লাশ ছিল, আমার সঙ্গে কোনো বই নাই, কি বই তিনি পড়াবেন জানতাম না বলে কোনো বই নিয়ে আসতে পারিনি, একটি বাঁধানো খাতা মাত্র আমার

হাতে ছিল, তা সামনের উঁচু বেঞ্চির উপর রেখে আমি চুপ করে বসে ছিলাম। মোহিতলাল আমার দিকে তাকাচ্ছেনও না। তাঁর দৃষ্টি উর্ধ্বে ন্যস্ত, কখনো বা চক্ষু অর্ধ-নিমিলিত, যেন ধ্যানস্থ হবার প্রয়াসী। তখনো গভীর ভাবে কি ভাবছেন। তাঁর যে সেই মুহূর্তে একটি নির্ধারিত কর্তব্য আছে, তা যেন তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। এ' অবস্থাটা পরেও তাঁর মধ্যে পড়াবার সময় দেখেছি। কিন্তু সে দিন মনে করলাম, এ ভাবে চুপ করে বসে থাকলে হয়ত পড়াই আর আরম্ভ হবে না, তাই সহসা সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদেরে কি কি বই পড়াবেন স্যার?

শুনবা মাত্র যেন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন, বল্লেন, তোমরা আর কোথায়?

আমি বল্লাম, আর কেউ নেই, আমিই একা।

তিনি বল্লেন, তুমিই একা? তা কি করে হয়?

এই বলে নাম ডাকবার খাতা খুলে তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার নামটি খুঁজে বার করলেন। তারপর তিনি আমার নামটি জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার নাম বললাম। তিনি বললেন, আরো ত একজনের নাম দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম, সে উপস্থিত নেই।

তিনি বললেন, তবে তুমি একা?

আমি বললাম, আমি একা।

তিনি আবার চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন, তারপর বললেন, আরো দু একদিন যাক, দেখি আর কেউ আসে কি না, তারপর পড়াতে আরম্ভ করব, আজ যে বিষয়ে পড়াব তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি।

এ'বার তিনি মধুসূদনের কাব্যের পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, আলোচনার মধ্যে মধুসূদন, হোমার, মিল্‌টন থেকে আবৃত্তি করতে লাগলেন; সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, ঘণ্টা বাজল, ঘণ্টা তিনি শুনতে পেলেন না; পরের ঘণ্টার অধ্যাপক দরজায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করে চলে গেলেন, তাঁর বক্তৃতার বিরাম নেই; তিনি অর্ধনিমীলিত নেত্রে কখনো উর্ধ্বপানে তাকিয়ে, কখনো নিমীলিত নেত্রে বুঝিবা নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আলোচনার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নেমে যেতে লাগলেন। আমি পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে তার সামনে বসে রইলাম। কতক্ষণ পর তাঁর বক্তৃতা থামল তা বলতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' নামক কবিতা সংকলনটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই আমাদের পাঠ্য ছিল। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তা পড়ানোর জন্য আমার (ক্লাশ আর আমাদের নয়, আমার একারই) ক্লাশে এসে প্রবেশ করলেন। হাতে বিরাট আকৃতির একটি বাঁধানো বই ও নাম ডাকবার খাতা। পরে জানতে পেরেছিলাম, বইয়ের মধ্যে সাদা পাতা জুড়ে কবিতার ব্যাখ্যা লিখে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, পড়ানোর সময় সেই লেখাগুলো পড়ে যেতেন; লেখাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখিত বহু চিঠিরও অনু-লিপি ছিল, তাও তিনি আমাকে পড়ে সেদিনই শুনিয়েছিলেন। প্রায় প্রত্যহ শোনাতেন।

তিনি ক্লাশে ঢুকে আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভিনন্দিত করে নিলেন। বললেন, তোমরা বুঝি দুজন? আর একজন কোথায়?

আমি আর একজনকে তখনো দেখিনি, সে আসেনি।

তিনি বরাবরই বড় আশাবাদী, বললেন, হয় ত আজ প্রথম দিন বলে জানতে পারে নি, কাল আসতে পারে।

আমি বললাম, হয়ত তাই।

আমি জানতাম, তিনি আমাদের সে দিন রবীন্দ্রনাথ পড়াবেন। কিন্তু পড়ানো বলতে যা বুঝায় তার তিনি কিছুই করলেন না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে কিছু গল্পগুজব করলেন; গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? তায় আবার রবীন্দ্রনাথের গল্প। তাই আমারো ভালো লাগল। কিন্তু তাঁর গল্প গুজব শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি মোহিতলালের কথাগুলো কানে এসে আবার বাজতে লাগল, তার কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু তা বুঝবার জন্য অন্তরে যেন এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা দেখা দিল।

নির্দিষ্ট সময় তালিকা অনুযায়ী ডক্টর সুশীলকুমার দে'র সঙ্গে যখন প্রথম ক্লাশ করবার জন্য তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, তখন দেখলাম, তাঁর ক্লাশে আরো তিন চারজন ছাত্র ও দুটি ছাত্রী বসে আছে। আমাকে দেখেই তিনি সহাস্যে বললেন, এসো, এসো, বসো।

তারপর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছেলেটি আমাদের বাংলাতে প্রথম বার্ষিক সাম্মানিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। সবাই আমার দিকে তাকাল, আমি বুঝতে পারলাম, তিনি অনেকগুলো ক্লাশ এক সঙ্গে নিচ্ছেন, এখানে যারা বসে আছে তারা উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। আমি সঙ্কোচের সঙ্গে এক কোণে গিয়ে বসলাম, এতগুলো ছাত্রছাত্রীর সামনে আমাকে যে তিনি 'ছেলেটি' বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাতে আমার সঙ্কোচের মাত্রা বেড়ে গেল। কি জানি, হয় ত প্রথম দিন থেকেই আমাকে তিনি খুব স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছেন।

ডক্টর দে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়াবেন। তিনি বললেন, এই বিষয়ে তিনি ম্যাকডোনালের ইংরেজিতে লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বইখানি অনুসরণ করবেন। সবারই বইখানি সঙ্গে থাকলে তাঁর বক্তৃতা বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে। আমি স্থির করলাম বইখানি আজই কিনে ফেলব, সবারই বইখানি সঙ্গে আছে দেখতে পেলাম।

ডক্টর দে মৃদু এবং মিষ্টভাষী, সর্বদা হাস্যমুখ। কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করবার সময়ও তার মুখ অকারণ গম্ভীর হয়ে ওঠে না, অনর্গল সহজ ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। কারণ, এই পত্রের জবাব ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। তাঁর বলবার সহজ ভঙ্গির গুণে তাঁর ইংরেজি ভাষাও সহজবোধ্য হয়ে উঠল। তিনি ঋক্‌বেদের ক্রমঃ-বিকাশ নিয়ে সে দিন আলোচনা করছিলেন। একটি এত দুরূহ বিষয় যে এত সহজে প্রকাশ করা যেতে পারে আগে তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। ঋক্‌বেদ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর সেদিনকার পড়ানোর উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে, আজো তা অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে নি। অথচ আদবে কায়দায়, চলায় ফেরায় তিনি ছিলেন একজন পাকা সাহেব, সংস্কৃত পণ্ডিতের গোঁড়ামি তার মধ্যে কিছুই ছিল না; তাতেই আমার বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথম দিন একটি সংস্কৃতের ক্লাশও করেছিলাম, তার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের দুটি সর্গ

পড়াবেন জানালেন। সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ আরম্ভ হতো, তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে ক্লাশে এসে ঢুকতেন, তথাপি একদিনও তাঁর বিলম্ব হতে দেখিনি। প্রথম দিন তা আমি বুঝতে পারিনি। এত সকালেও ক্লাশ করে আমার কোনদিন অভ্যাস নেই। আমি জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম, 'সুতরাং আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় মধ্যেই থাকতাম। তবু প্রথম দিন সাড়ে দশটায় ক্লাশে গিয়ে পৌছুতে পারলাম না। ১০ মিনিট দেরী হয়ে গেল। গিয়ে দেখি, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাশের মধ্যে চুপ করে চেয়ারে বসে আছেন। ছাত্রের আসন শূন্য। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঢুকবার অনুমতি চাইলাম। তাঁর মুখের তুলনায় চোখ দুটো খুব বড়; তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তাঁর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আমার প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হলো। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ স্নেহভরে বললেন, এসো, এসো, তোমার জন্যই ত আমি বসে আছি।

আমি ভরসা পেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তিনি অবিলম্বে কোনো ভূমিকা না করেই তৎক্ষণাৎ উচ্চকণ্ঠে 'কিরাতার্জুনীয়মে'র পাঠ্য অংশের প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন, আবৃত্তি কালে তাঁর দৃষ্টি কখনো ঊর্ধ্বে কখনো পার্শ্বে কখনো নিম্নদিকে ঘূর্ণায়িত হলো; মুহূর্তের জন্য বইটি খুলেও দেখলেন না, বুঝলাম আদ্যোপান্তই তাঁর মুখস্থ।

এই ভাবে দীর্ঘ তিন বছর সময় যে কি ভাবে কেটে গেল, তা বুঝতেও পেলাম না। ইতিমধ্যে কয়েকটি আবশ্যকীয় পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, যেমন ব্যবহারিক ইংরেজি (Practical English) এই বিষয়টি প্রত্যেক স্নাতক ছাত্রকেই উত্তীর্ণ হতে হতো দুটি সহযোগী (subsidiary) বিষয় আমার ক্ষেত্রে তা ছিল ইতিহাস ও দর্শন। এবার সাম্মানিক বিষয়ে শেষপরীক্ষা দেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হলো।

১৯৩১ সনে সেই পরীক্ষাতেও যথারীতি দু'জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হয়ে এবার মাত্র এক বছর স্নাতোকোত্তর বিভাগে পড়বার পালা আরম্ভ করলাম। দ্বিতীয় বার্ষিক সান্মাসিক স্নাতক শ্রেণীতে উঠে একজন অনুত্তীর্ণ ছাত্রকে সতীর্থ রূপে পেয়েছিলাম।

১৯৩২ সনের সংস্কৃত ও বাংলার স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্য তালিকাটিও এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি।

প্রথম পত্র : বৈদিক সাহিত্য
পাঠ্য—ম্যাকডোনালের বৈদিক পাঠ (Vedic Reader)
ম্যাকডোনালের বৈদিক ব্যাকরণ (Vedic Grammar)

দ্বিতীয় পত্র : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস :
পাঠ্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এ'র ODBL. Vol. I, II.

তৃতীয় পত্র : (ক) বৌদ্ধগান ও দোহা
(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
(গ) বিদ্যাপতির পদাবলী
(ঘ) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

চতুর্থ পত্র : ঊনবিংশ শতাব্দীর পদ্য ও গদ্য—
বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পত্র : পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত সংস্কৃত ও বাংলা গদ্য-পদ্য : প্রবন্ধ রচনা।

তার মধ্যে কোন্ ফাঁকে জানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও পড়তে হতো। ডঃ দে তা আমাদের পড়াতেন। তিনি বলতেন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইখানিই ক্লাশে নিয়ে এসো, আমি তার ভুলগুলো দেখিয়ে দিব, তোমরা তাতেই সংশোধন করে নিবে। আমরা তাই করতাম, তিনি প্রধানতঃ তার 'ভুল'গুলো নিয়েই তাঁর নিজের মতে আলোচনা করতেন।

ডক্টর দে এবারও স্নাতকোত্তর বিভাগে বৈদিক সাহিত্যে ঋক্‌বেদের কতকগুলো নির্দিষ্ট সূক্ত টীকাটিপ্পনী সহ পড়াতে লাগ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও পড়াতেন। অনেক আগেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ফিরে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন, তিনি তাঁর নির্দিষ্ট বিষয় স্নাতকোত্তর বিভাগেও পড়াতে লাগলেন, তা ছাড়া শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারও যে যাঁর বিষয় পড়াতে আরম্ভ করলেন। এবার পাঠ্যকাল মাত্র এক বছর। অতি দ্রুত এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। যথা সময়ে পরীক্ষা হলো। আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হলাম। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'লো, আর একজন পরীক্ষা দিলনা। সে'বার আমরা তিনজন ছাত্রই ছিলাম।

শিক্ষক

স্নাতকোত্তর বিষয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'বার পর একদিন যখন ডক্টর সুশীল কুমার দে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছি, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তুমি কি করবে ভেবেছ ?

আমি বললাম, গবেষণার কাজই করব ভেবেছি। আর কোনো কাজের দিকে যাব না।

দেখলাম, তিনি খুব খুসী হলেন। অনেকে এই অবস্থায় চাকুরির কথাই বলে, তারপর চাকুরি পেয়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা হলে গবেষণা করতে পারে বলে জানায়। তাতে যাঁরা প্রকৃতই পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁরা কখনো খুসী হতে পারেন না, তা আমি জানতাম, তাই আমি তাঁর কাছে চাকুরির কথা একেবারেই তুললাম না।

তিনি বললেন, একটা খুব ভালো বিষয় তোমার জন্য আমি ভেবে রেখেছি। বিষয়টি হচ্ছে চৈতন্য ধর্মের শেষ পর্বের ইতিহাস (Later History of Caitanya Movement). তারপর বুঝিয়ে বললেন, তাঁর একজন ছাত্রীকে তিনি এই বিষয়ে আদি পর্বের ইতিহাস লিখতে দিয়েছেন, নিজে মধ্য পর্বের ইতিহাস লিখছেন এবং তারই শেষ পর্বের ইতিহাস রচনার ভাব আমার উপর দিয়ে তিনি 'নিশ্চিন্ত' হতে চান।

আমি ত মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। যে বিষয়ের একটি পর্ব সম্পর্কে ডক্টর দে নিজে লিখবার ভার নিয়েছেন তার আর একটি পর্ব রচনার ভার আমার উপর দিয়েছেন? আর তা লিখতে হবে ইংরেজি ভাষায়? বাংলা ভাষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো কোনো গবেষণা পত্র গৃহীত হতো না।

তারপর তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা এমনভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন যে তা থেকে তাঁর সত্য সত্যই বিশ্বাস হল যে এই বিষয় নিয়ে আমার দ্বারা গবেষণা

করে গ্রন্থ রচনা করা প্রকৃতই অসম্ভব কিছু নয়। তাঁর পরিকল্পনাটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অবিলম্বে পড়াশোনার আরম্ভ করবার পরামর্শ দিলেন। তাঁর প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি জানিয়ে তাঁর সামনে থেকে চলে এলাম। সেখান থেকে এসেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন এ কথা আজ আর কারো কাছে অজানা নেই। তাঁর কাছে সব কথা খুলে বল্লাম। তিনি শুনে বল্লেন, তোমার বাড়ী মৈমনসিং জেলায়, মৈমনসিং গীতি-কার দেশে ; তুমি গবেষণা করবে লোকসাহিত্য নিয়ে। তালপাতার পুঁথি ঘেঁটে কি করবে? তবে ডক্টর দে ত বিভাগীয় প্রধান, তাকে খুসী করতে না পারলে তোমার গবেষণা-বৃত্তি ত পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং তোমাকে দুটো কাজই করতে হবে। এখানে তাকে খুসী করবার জন্য তোমাকে পুঁথি ঘাঁটতে হবে, আবার বাড়ীতে যখন যাবে তখন লোকসাহিত্য সংগ্রহ করবে। দুটোই তোমার জীবনে কাজে লাগবে।

সত্যই ত গবেষণা বৃত্তিরও ত আমার প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচীন পুঁথিশালায় বসে দিবারাত্র বৈষ্ণব পুঁথি পড়তে লাগলাম। ডঃ দে বলেছিলেন, কোনো পুঁথির উক্তি পরীক্ষা ও বিচার না করে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করবে না, কারণ, বৈষ্ণবেরা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত, প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী পুঁথির বিষয় যথেচ্ছ পরিবর্তন করেছে। সুতরাং তথ্য বিষয়ে সাবধান হতে হবে। আমি এতই সাবধান হলাম যে কোনো তথ্যই নির্ভযোগ্য বলে গ্রহণ করলাম না। ছয় মাস এইভাবে কেটে গেল, ভিতরে ভিতরে আমার মন কেমন যেন এই নিষ্ফল অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। বৃত্তি পেলাম সত্য, কিন্তু তাতেও তৃপ্তি পেলাম না। বাইরের উন্মুক্ত আকাশ যেন আমাকে ডাকছে, কেবলই ডাকছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য ডঃ দেকে বলে বাড়ীতে এলাম। লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল, আর ঢাকা ফিরলাম না। ফিরব না বলে স্থির করলাম। ভাবলাম, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। ডক্টরদে'কেও কিছু জানালাম না ; কেবল মাত্র ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে জানালাম, আমি লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করছি। আবার ঢাকায় কবে ফিরব জানি না।

জন্মলগ্নে ভাগ্যবিধাতা যার ললাটে ঘূর্ণির নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, তাকে কি প্রাচীন পুঁথিশালার অন্ধকারের মধ্যে কেউ বেঁধে রাখতে পারে? বিশ্বজোড়া পুঁথিশালা তিনি তার জন্য গড়ে রেখেছেন। বর্ষার সময়ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লোম শান্তি-নিকেতনের উদ্দেশ্যে। তখন ১৯৩৩ সন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই ছিলেন, আমার এক ঢাকার বন্ধু সেখানে শিক্ষকতা করতেন। তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। মহামহো-পাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বল্লেন, এখানে তিব্বতী ভাষায় গবেষণা করবার জন্য একটা বৃত্তি আছে, ইচ্ছে করলে তা নিতে পার। কিন্তু তার বৃত্তি মাসিক মাত্র ২০ টাকা, আর এখানকার বিদ্যালয়ে পড়ালে আহার বাসস্থান বিনামূল্যে। আমি ভাবলাম, আবার গবেষণা?

এবার সরকারি রেলওয়ের শিক্ষা বিভাগের একটি চাকুরিতে ডাক পেলাম, তার প্রধান আকর্ষণ, রেলের অনুমতি পত্র নিয়ে বিনামূল্যে যদৃচ্ছা ভারতব্যাপী রেল ভ্রমণ। কেবল মাত্র এই আকর্ষণে কোনোদিক বিবেচনা না করে এই চাকুরিতে যোগ দিলাম। আপাতত: আসানসোলে থাকতে হবে। তারপর দু তিন বছর ধরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিনামূল্যে ভ্রমণের আনন্দেও যখন ক্লান্তি এল তখন সাহিত্য রচনায় মন দিলাম। এইটি গল্পের বই প্রকাশিত হলো, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ঋণের

কথা স্মরণ করে বইখানি তার নামে উৎসর্গ করলাম, একখানি বই তাঁর ঠিকানায় পাঠালাম। ডক্টর দের নিকট আমি অপরাধী, তাঁর কাছে এক খানি বই পাঠানোরও সাহস নেই। তাই সে কাজ আর করলাম না। কিন্তু আমার বইয়ের প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সুরেশচন্দ্র দাস একখানি বই নিজে থেকেই ডক্টর দে'কে উপহার দিল। তিনি চিরদিনই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি, তিনি বইখানি পড়েই তার কাছে আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন, শ্রীসুরেশ দাস আমার ঠিকানা তাঁকে জানিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমার কাছ থেকে বইখানি পেয়ে প্রাপ্তি সংবাদে তাঁর আশীর্বাদ সহ আর একটি কথা লিখে জানালেন, তিনি লিখলেন, সেই বছর (১৯৩৭) ২রা আগস্ট তারিখ থেকে শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর শূন্য পদে যাতে আমাকে নেওয়া হয়, সে জন্য তিনি ডক্টর দে'কে বলেছেন। তাঁর সঙ্গে তিনি আমাকে যোগাযোগ করতে বললেন।

আমি তাঁর সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ করব ? আমি যে তাঁর কাছে কত অপরাধী তা ত কেবল আমিই জানি। তাঁর কাছে চিঠি দিবার আমার মুখ কোথায় ?

এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খামে আমার নামে একখানি চিঠি এল। চিঠিখানির উপর ডঃ দে'র হাতে লেখা আমার ঠিকানা। আমার মনে হলো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে চুক্তি ভঙ্গ করেছি, তারই ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য এই চিঠি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তি নিতে হলে তার সঙ্গে চুক্তি করতে হয় যে গবেষণাকারী যদি গবেষণা কর্ম শেষ না করে, তবে যে পরিমাণ বৃত্তি সে গ্রহণ করেছে, তা সম্পূর্ণই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি এই চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। আমার মনে হ'লো, এতদিন আমার ঠিকানা কেউ জানত না বলে কেউ আমার টাকা আদায় করতে পারে নি। আজ ঠিকানা জেনে তারই ব্যবস্থা করেছে। তাই আমি চিঠিখানি খুলতেও সাহস পাইনি। অবশেষে মরীয়া হয়ে চিঠিটি খুলে ফেললাম। পড়ে দেখলাম, ডক্টর দে আমার গল্পগুলোর প্রশংসা করে লিখছেন ,ছোটগল্পে তোমার বেশ হাত দেখতে পেলাম। ত'রপর তোমাকে জানাচ্ছি, চারু বাবু ২রা আগষ্ট থেকে অবসর নিচ্ছেন, আমাদের বিভাগে একজন লোক প্রয়োজন, তুমি আসতে পারবে কি না জানিও।

চিঠিটি পড়ে আমার চোখে জল এল। আমি তৎক্ষণাৎ তার জবাবে জানিয়ে দিলাম, আমি আসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব আর এক চিঠিতে লিখলেন, তুমি আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র ঢাকা চলে এসো। কারণ, আরো প্রার্থী জুটে যেতে পারে, সামনে উপস্থিত থাকা তোমার একান্ত আবশ্যক।

আমি আমার সেখানকার কর্ম থেকে ছুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ঢাকায় গিয়ে পৌঁছে শুনি, আমার মৈমনসিংহের বাড়ীর ঠিকানায় ইতিমধ্যেই আমার নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে নিযুক্ত করে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমার মৈমনসিংহের বাড়ীর ঠিকানা বিশ্ববিদ্যালয়েকে জানিয়েছিলেন। আপিশ থেকে তার অনুলিপি সংগ্রহ করে ২রা আগস্ট ১৯৩৭ সনে যথা সময়ে আমি কর্মে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বলাই বাহুল্য এই কাজের জন্য আমাকে কোনো মামলী দরখাস্তও করতে হয়নি।

২রা আগস্ট ১৯৩৭ সনের আগের দিনই সন্ধ্যায় ডক্টর দে'র বাড়ীতে গিয়ে কি কি বিষয় আমাকে পড়াতে হবে জেনে এসেছিলাম। আপাততঃ অধ্যাপক শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যা পড়াতেন তা সবই আমার উপর পড়ানোর ভার পড়ল। পরদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ক্লাশ করব। সেদিন সাড়ে দশটাতেই আমার ক্লাশ, প্রথম ক্লাশে পড়ানোর বিষয় বৈষ্ণবপদাবলী, তারপর অন্যান্য ক্লাশে অন্যান্য বইও ছিল।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কিছু বেড়েছে, পাঠ্য-তালিকায় কিছু পরিবর্তন হওয়ার ফলে সংস্কৃত না জানা ছাত্র-ছাত্রীও এই বিষয় নিয়ে পড়তে কিছু কিছু আরম্ভ করেছে। আমার প্রথম দিন প্রথম ক্লাশটি নিতে গিয়ে দেখলাম, তাতে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে চারটি ছাত্র, তারাও সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, নূতন তাদের মনে কত আশা, কত স্বপ্ন; আমিও নূতন, তবে আমার মনে আশা ও স্বপ্ন সফলতার আনন্দ। তা আমি প্রকাশ করতে পারছি না। একদিন আমি এখানে ছাত্ররূপে সঙ্কোচের সঙ্গে এই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছি, আজ শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস নিয়ে নূতন ছাত্রদের জীবনের নূতন আশায় ও স্বপ্নে উজ্জীবিত করে তুলবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে এসেছি; আমার মনে হলো, আমার জীবনে এর চাইতে বড় সার্থকতা আর কিছুই হতে পারে না, এমন সন্তুষ্টি আমার জীবনে আর কিছুতেই আমার আসেনি। আমি মনে মনে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, আমার পরম স্নেহশীল অধ্যাপকদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাম ডাক-বার খাতাটি খুললাম, দেখলাম, খাতাটির উপর অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি লেখা, মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে খাতাটি খুলে চারজন ছাত্রের উপস্থিতি লিখে নিলাম। তারপর ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাদের নাম ধাম ও বাড়ীঘরের পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। সেই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই আমার ছাত্র রূপে সেই ক্লাশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু আমার গভীর বেদনার কারণ হয়েছে।

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম দিনের প্রথম ক্লাশে যে চারটি ছাত্র উপস্থিত ছিল, তাদের নাম আজো স্মরণ করতে পারি, তারা (১) মুহম্মদ আব্দুল হাই, (২) মুহম্মদ হবিবুর রহমান, (৩) জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৪) অক্ষয়কুমার সেনশর্মা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের নিজে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছিল, সেই আদর্শের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, তাই তা সর্বত্রই অনুসরণ করেছি। তার ফলে একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের আসন লাভ করবার গৌরবের অধিকারী হয়েছিলাম। সেইদিন আমি মনে করেছিলাম, এই গৌরব আমার নয়, আমার পরম প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, আমি তাঁর উপলক্ষ্য মাত্র।